

## কিশোর কিশোরীদের আত্মহত্যা রোধে চাই সকলের সহযোগিতা

সনৎ কুমার বিশ্বাস

একমাত্র বাসযোগ্য ও ছায়া সুনিবিড় এই পৃথিবী থেকে মানুষের বিয়োগাত্মক পরিণতি বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম অনাকাঙ্ক্ষিত কারণ আত্মহত্যা। যার সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত আমাদের চারপাশের পরিবেশ এবং ব্যক্তির আবেগ বা মন। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আর তা থেকে জন্ম নেয়া তীব্র কষ্ট, হতাশাসহ অন্যান্য নেতিবাচক বিষয়ের সম্মিলিত ও চূড়ান্ত পরিণতি আত্মহত্যা।

ফারিয়া অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বয়স (১৫)। ফারিয়ার মায়ের সাথে তার সম্পর্ক বন্ধুর মতো। হঠাৎ একদিন তার মা লক্ষ্য করল হাসিখুশি ফারিয়া ফল কাটার ছুরি দিয়ে হাতের কবজি কাটার চেষ্টা করছে। আরেকদিন খেয়াল করলো প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ফারিয়া গোসল করে ফুল হাতার সুইটার পড়ে ঘুরছে। তখন তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করলো এত গরমে তুমি এসব কি করছ। তখন ফারিয়া তার মাকে জড়িয়ে ধরে হাইমাউ করে কেঁদে উঠলো। প্রিয় সন্তানের এমন ক্ষতি করার চেষ্টা সে সময় তার পরিবারের উপর এক বড়ো বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। চিকিৎসকরা সে সময় জানিয়েছিল তাদের মেয়েটি আত্মহত্যা প্রবণতায় ভুগছে। শহরে শিক্ষিত এই পরিবারটি খুব দূতই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলো। শুধু ফারিয়া নয় তার মতো আমাদের দেশে অনেক তরুণ তরুণী আছে যারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

আত্মহত্যায় প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বিশ্বে আত্মহত্যা করছেন ৭ লাখেরও বেশি মানুষ। করোনাকালীন সময়ে এক বছরে বাংলাদেশে আত্মহত্যায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ হাজারেরও বেশি মানুষের। ডব্লিউএইচও'র তথ্যমতে, বিশ্বে মোট আত্মহত্যার ৭৭ শতাংশ ঘটছে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। তাদের মধ্যে আছে সববয়স ও শ্রেণি পেশার মানুষ। যাদের মধ্যে তরুণের সংখ্যাই বেশি। গবেষকদের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে অন্তত প্রতি ১০ জনে একজন কিশোর কিশোরীর মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আত্মহত্যাকে ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আত্মহত্যার পূর্বাভাস কৈশোরেই পাওয়া যায়। সেটা সম্ভব হয় কিশোর কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা আছে কি না তা বুঝার মাধ্যমে। তারা বলছেন, আত্মহত্যার চিন্তা, পরিকল্পনা এবং চেষ্টা এ তিনটি বিষয়ের কোনও একটি যদি কারও মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার আত্মহত্যা প্রবণতা আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বে আত্মহত্যার হার এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনতে হবে।

যেসব কারণে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, এর অন্যতম হচ্ছে বুলিং। চরম হতাশা ও অসহায় বোধ থেকে কিশোর কিশোরীরা এই পথে পা বাড়ায়। মাদকাসক্তের মতো সমাজবিরোধী আচরণও আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ায়। বাংলাদেশে যেসব পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায়, সেগুলো হলো- সাইবার ক্রাইমের শিকার, যৌতুক প্রথা, মা-বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকা, পারিবারিক কলহ, পরকীয়া, প্রেমে ব্যর্থতা, চাকরি হারানো, দীর্ঘদিনের বেকারত্ব, দরিদ্রতা, প্রতারণার শিকার, ব্যবসায় বড়ো ধরনের ক্ষতি, প্রিয়জনের মৃত্যু, পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না পাওয়া, সন্তানের প্রতি মা-বাবার তাচ্ছিল্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব, যৌন সহিংসতা এবং নির্যাতনের শিকার হওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও, আত্মহত্যা প্রবণতার অন্যতম কারণ বিষণ্ণতা, ইনসমনিয়া ও সিজোফ্রেনিয়ার মতো মানসিক অসুস্থতা। বঞ্চনা, ক্ষোভ, একাকীত্ব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতাও আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়ায়। বর্তমানে সাইবার বুলিংয়ের কারণে আত্মহত্যা সংশ্লিষ্ট আচরণ ক্রমেই বাড়ছে।

দেশে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর কমপক্ষে ১৩ থেকে ৬৪ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে। এর মধ্যে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ কিশোর আর ১১ দশমিক ৭ শতাংশ কিশোরী। উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে ছেলেদের আত্মহত্যার হার বেশি হলেও মধ্যম আয় আর নিম্ন আয়ের দেশে এই হার ইদানিং বাড়ছে। বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান লাইফস্প্রিং লিমিটেড সম্প্রতি এ নিয়ে জরিপ করে। বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্টে বোঝা যায় যে, দেশে আত্মহত্যার হার বাড়ছে। এখন পর্যন্ত দেশে আত্মহত্যার সঠিক হার নির্ণয় না করা গেলেও গবেষণায় দেখা যায়, কিশোর কিশোরী এবং কমবয়সি তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত বাংলাদেশি জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে দ্য ল্যানসেট এ প্রকাশিত 'ই ক্লিনিক্যাল মেডিসিন নামক ওপেন এক্সেস পিয়ার রিভিউড জার্নালে। এই গবেষণায় এসেছে সামগ্রিকভাবে কিশোর বয়সের মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা সমবয়সি ছেলেদের চাইতে বেশি। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক বলেন, বাংলাদেশে ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। তবে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে তেমন খুব একটা পার্থক্য নেই। কিশোর কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন জানিয়ে তিনি বলেন, ইকোলজিক্যাল সিস্টেমের কারণে পারিবারিক পরিবেশ, নিজেদের বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, চারপাশ এবং সর্বোপরি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক বিষয়ও এই শ্রেণিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। আত্মহত্যায় পরীক্ষা পদ্ধতি, স্কুলিং, রেজাল্ট, এসবও প্রভাব ফেলে। উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে ছেলেদের আত্মহত্যার হার বেশি। কিন্তু মধ্যম আয় আর নিম্ন আয়ের দেশে এই হার সমান সমান বলেন, গবেষণা দলের নেতৃত্বদানকারী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ।

আত্মহত্যা নিয়ে আমাদের সমাজে কিছু স্টিগমা আছে সেটা হলো আত্মহত্যা প্রবণতাকে ব্যক্তির গুরুতর সমস্যা হিসেবে আমরা মেনে নিই না। ফলে এই সমস্যা থেকে বাঁচতে ব্যক্তি নিজে অন্যের সাহায্য চাইতে আগ্রহ দেখায় না। আবার অন্যরাও আত্মহত্যা প্রবণ ব্যক্তিকে সাহায্য করার বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখেন না। দ্রুত পরিবর্তনশীল এ সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেকেই আত্মহত্যা করতে পারেন। কিশোর কিশোরী ও তরুণ তরুণীদের মধ্যে এর ঝুঁকি বেশি। প্রাণঘাতী এ সমস্যা থেকে তাদের উদ্ধারে সমাজের যে কেউ হতে পারেন একজন সক্রিয় কর্মী। এজন্য আত্মহত্যার আর্লি ওয়ার্নিং সাইন বা পূর্বাভাস সম্পর্কে সবার ধারণা থাকা প্রয়োজন। আত্মহত্যার আর্লি ওয়ার্নিং সাইন হলো, বারবার মরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা, নিজেকে আঘাত করা, হঠাৎ করে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, ঘুম না হওয়া, খাওয়াদাওয়ায় অনীহা, চরম হতাশা, পাপবোধ, চরম লজ্জিত ও অপদস্থবোধ ইত্যাদি। এছাড়াও, মৃত্যুসংক্রান্ত গান, চিত্রাঙ্কন ও লেখায় তার আগ্রহ বেড়ে যেতে পারে। নিজের প্রিয় জিনিসপত্র অন্যকে বিলিয়ে দেওয়া, হঠাৎ করেই সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, এ সবই আত্মহত্যা প্রবণতার লক্ষণ। যারা আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেন, তাদের কথাবার্তায় সরাসরি মৃত্যুর কথা প্রকাশ পায়। এছাড়াও, কিছু শারীরিক ও আচরণগত পরিবর্তন দেখা যায় দ্রুত ওজন বেড়ে যাওয়া, নিজের যত্ন নেওয়া ছেড়ে দেওয়া, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় দাগ, কাটা, ঘা বা ইনজেকশনের সূচের দাগ।

যদি কখনো মনে হয় যে, আপনার পাশের মানুষটি এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে, তবে দেরি না করে তার কাছে সরাসরি এ বিষয়ে জানতে চান। এক মুহূর্ত দেরি না করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমেই তার কাছে সরাসরি জানতে হবে, সে আত্মহত্যার কথা ভাবছে কিনা, সে কতখানি ঝুঁকিতে আছে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরখ করতে হবে। আপনি নিজে যদি এ বিষয়ে জানতে আত্মবিশ্বাসী বা অভিজ্ঞ না হয়ে থাকেন, তবে দ্রুত এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে, যিনি এ বিষয়ে জানেন। আত্মহত্যা এমন একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা, যা প্রতিরোধযোগ্য। একে মোকাবিলা করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। আত্মহত্যা প্রতিরোধের ৪টি প্রমাণিত ও কার্যকর ইন্টারভেনশনের সুপারিশ আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। এগুলো হলো- আত্মহত্যার সরঞ্জাম হাতের কাছে সহজলভ্য না রাখা (যেমন: কীটনাশক, আগ্নেয়াস্ত্র, নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ ইত্যাদি); আত্মহত্যা নিয়ে দায়িত্বশীল প্রতিবেদন প্রচারে গণমাধ্যমকে যুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান; কিশোর কিশোরীদের সামাজিক ও আবেগীয় জীবন দক্ষতায় পারদর্শী করা এবং আত্মঘাতী আচরণ দ্রুত শনাক্ত করা, যাচাই করা, ব্যবস্থা নেওয়া এবং ফলোআপ করা। মনে রাখতে হবে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত নিলে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

আত্মহত্যার চিন্তা মাথায় এলে তা লুকিয়ে রাখা উচিত না। বন্ধু বা বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তা শেয়ার করা। নিজের ওয়ার্নিং সাইনগুলো চেনার চেষ্টা করা। ওয়ার্নিং সাইনগুলো দেখামাত্র বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া দরকার। এছাড়া, আত্মহত্যার চিন্তা থেকে দূরে রাখে এমন কাজে দ্রুত সম্পৃক্ত হওয়া, সামাজিক সম্পর্কগুলো বাড়ানো এবং মানসিক সহায়তা দিতে পারবে এমন কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, ক্ষতিকর ও বিষাক্ত দ্রব্য যা দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করা যায়, তা আশপাশ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, নিজ দায়িত্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া। যেমন: ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, প্র্যাকটিসিং সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট অথবা সাইকোথেরাপিস্ট। এ ছাড়াও, জরুরি সেবা পেতে হটলাইন সেবায় যোগাযোগ করা উচিত। যেমন: ৯৯৯ অথবা ১৬২৬৩ নম্বরে।

আত্মহত্যা থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য স্কুল কলেজসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে পর্যাপ্ত কাউন্সেলিং ও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া কিশোর কিশোরীদের আত্মহত্যার জগত থেকে দূরে সরিয়ে আনতে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা, অনুপ্রেরণামূলক গল্প প্রচারের পাশাপাশি আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে পরিবারের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবই সবচেয়ে বড়ো সমাধান। সচেতন হওয়া দরকার সবার। অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে বের হতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে হবে। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। আসুন, আত্মহত্যা থেকে না বলি। জীবনকে ভালোবাসতে শিখি।